বনলতা টি কেবিন

ফাইয়াজ ইফতি

উৎসর্গ

আমি এবং বাংলাদেশের আরও কয়েক লক্ষ বেকার যুবকদের। যারা মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে, আত্মীয় স্বজনদের ভীড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে, হতাশা আর একাকীত্বের সঙ্গ নিয়ে দমবন্ধ করা অন্ধকার এক পৃথিবীতে বসবাস করতে দিন দিন অভ্যস্থ হয়ে পড়ছেন।
শক্ত থাকতে হবে কমরেড!

"শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দিবেন, যে তুমি খুশি হয়ে যাবে (সূরা আদ দোহা:৫)"।

লেখকের কথা

বনলতা টি কেবিনকে আমি নানা জায়গায় নিরীক্ষাধর্মী কাজ বলে দাবী করেছি। যখন লেখক এ ধরনের কিছু দাবী করেন তখন পাঠকের আগ্রহের মূলবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়, কী নিরীক্ষা করেছেন লেখক? নতুন কোনো জনরা, সাবজনরা, রাইটিং টুল, প্যাটার্ন, কোন জায়গায় এটা আলাদা অন্য বইয়ের থেকে?

এই প্রশ্নটা আমিও অনেকবার করেছি নিজেকে। কোন জায়গায় এটা আলাদা? এত বড়ো মুখ করে যেই নিরীক্ষাধর্মী হওয়ার দাবী তুলছি, আসলে কোন জায়গায় নিরীক্ষা করেছি সেটা পাঠককে জানাতে তো হবে নাকি?

আমি শুরুতেই সবার কাছে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী, নিরীক্ষাটা আসলে লেখার ওপরে নয়, নিরীক্ষাটা লেখক হিসেবে নিজের ওপরে করেছি, তাই যুগান্তকারী কোনো নতুন রাইটিং টুল আবিষ্কার বা নতুন কোনো সাব জনরা, কোনো প্যাটার্নের আবিষ্কার—এসবের আশা দিয়ে থাকলে আমায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বনলতা টি কেবিন আমার রাফ খাতা, বা খসড়া খাতা। নিজেকে নিয়ে, নিজের লেখালেখি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে এর জন্ম। থ্রিলার লিখতে বসে একদিন মনে হলো থ্রিলার মানেই কাঠখোট্টা আর সামাজিক উপন্যাসে মেলোড্রামা, এই জিনিসটা ১৮০° ঘুরিয়ে দিয়েও থ্রিলার লেখা সম্ভব? থ্রিলারে মেলোড্রামা মেশালে কি অতি অখাদ্য কিছু হয়ে যাবে? চেষ্টা করা যাক। একদিন মনে হলো লেখালেখিতে অতি বিখ্যাত একটা টুল আছে, *'শো, ডোন্ট টেল'*। আচ্ছা, একগাদা *'টেল, ডোন্ট শো'* করে দেখবো নাকি জিনিসটা কী দাঁড়ায়? আচ্ছা, যদি টার্ন অ্যান্ড টুইস্টের জায়গা বাদ দিয়ে দিই, যদি শুরুতেই কে করছে, কেন করছে বলে দিই, তাহলে কি পাঠককে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব? ওটা কি থ্রিলার থাকবে তখনো? একটা টুল আছে *'ডিউস এক্স ম্যাকিনা'* অর্থাৎ পুরাণে যেরকম হুট করে দেবতা জিউসকে মর্ত্যে নামিয়ে অসম্ভবকে সম্ভবে রূপ দেওয়া হয়, তেমনি হুট করে অদৃশ্য বা অনুপস্থিত কিছু একটা দৃশ্যপটে টেনে এনে সমাধান করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পাঠককে টুইস্ট দেওয়া। একে লেখকের দুর্বল লেখনশৈলী হিসেবেও ধরা হয়। ভাবলাম, টুইস্ট যেহেতু নেই একটা ডিউস এক্স ম্যাকিনা কি সচেতনভাবে দেওয়া যায়?

এই উদাহরণগুলো নমুনা হিসেবে এই মুহূর্তে মাথায় আসছে, তবে গোটা বনলতা জুড়ে আমি এরকম অনেক নিরীক্ষা নিজের সাথে করেছি। বারবার নিজের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি, সেটা থেকে নিজে নিজেই উৎরানোর চেষ্টা করেছি। কোনটা সফল হয়েছে, কোনোটা হয়তো হয়নি। এভাবেই বনলতার জন্ম হয়েছে। তাই বনলতা টি কেবিন যতটা না নিরীক্ষাধর্মী কাজ হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি যেটা হয়েছে সেটাকে বলে – 'জগাখিঁচুড়ি'!

২০২১ সালে লেখা শেষ হলেও এটা পাঠকের হাতে তুলে দেবার উপযোগী কিছু কিনা সেটা ভাবতে ভাবতেই প্রতিবছর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছি। সত্যজিৎ রায়ের একটা ছোটোগল্প পড়েছিলাম, 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' নাম। একজন বিশুদ্ধতাবাদী চিত্রশিল্পী যিনি কিনা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টকে কোনো আর্টফর্ম হিসেবেই মানেন না, তিনি একটা প্রতিযোগিতার জন্য ছবি আঁকছিলেন দিনরাত এক করে। ছবিটার জন্য তিনি প্রচণ্ড খাটছিলেন, আগে আলাদা একটা ক্যানভাসে রং মিশিয়ে পরীক্ষা করে তারপর মূল ক্যানভাসে সেই রংয়ের আঁচড় কাটছিলেন। অথচ জমা দেওয়ার সময় ভুল করে মূল ছবির বদলে ঐ রং পরীক্ষা করার এবড়ো থেবড়ো দাগ কাটা ক্যানভাসটা জমা দিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড অসম্মান আর অপমানের ভয় নিয়ে তিনি ফাইনাল এক্সিবিশনের দিন হাজির হন, গিয়ে জানতে পারেন উনার সেই খসড়া ক্যানভাসটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে!

বনলতা আমার সেই খসড়া ক্যানভাস, দাগ কাটা, আঁকিবুঁকিতে ঠাসা। যেটার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো আমায় প্রতিদিন নতুন কিছু শিখিয়েছে, ঋদ্ধ করেছে, নতুনভাবে নিজেকে; নিজের লেখনশৈলীকে বুঝতে সাহায্য করেছে, যেটা আমায় প্রতিবার অন্যান্য লেখায় উন্নতির চেষ্টা করার সাহস দিয়েছে। বহুদিনের চেষ্টার পর এই বইটা প্রকাশ করার উদ্যোগে নিজেকে সম্মত করতে পেরেছি। সাথে সাথে ঐ শিল্পীর মতো অপমানিত হওয়ার ভয় নিয়ে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছি। যদি পাঠক ঠিকভাবে গ্রহণ করেন তাহলে ভাববো আমিও অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যাটগরিতে পুরস্কারটা পেয়ে গেছি!

ফাইয়াজ ইফতি
কালীবাড়ি রোড, সুনামগঞ্জ।

প্রারম্ভ

কালীবাড়ি রোড, সুনামগঞ্জ,
১৫ বছর আগের এক সন্ধ্যা।

লাল ডায়ারিটায় বয়সের ছাপ স্পষ্ট, চামড়া ক্ষয়ে গেছে, পাতাগুলো হলুদ আর ঝরঝরে, ফাউন্টেনপেনের কালি লেপ্টে অধিকাংশ লেখাই পড়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তবে ঠিক ওপরটাতে মুক্তোর মতো ঝকঝকে অক্ষরে লেখা, ***'ডা. মো. রমজান আলী, বি এ, বিটি'***—এখনও যেন জ্বলজ্বল করছে। ডা. মানে শখের বশে পড়াশোনা করে হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায় পাশ করা ডাক্তার, পেশায় ছিলেন শিক্ষক, পড়াতেন ইংরেজি। *'বাম্বু স্যার'* নামে পুরো শহরে এক নামে পরিচিত ছিলেন, নামের বহর থেকেই বোঝা যায় পড়ানোর পাশাপাশি উনার সরবরাহ করা উত্তম-মধ্যমও বিখ্যাত ছিল শহরে!

উনার সময়কার সমাজটাই ছিল ওরকম, অভিভাবকরা মাস্টারদের কাছে বাচ্চা দিয়ে বলতেন, "স্যার, দিয়ে গেলাম। মানুষ বানিয়ে ফেরত দিবেন, হাড্ডি আমার–মাংস আপনার।" এখনকার মতো শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা কিংবা শারীরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান তখন ছিল না। পিতা-মাতা, শিক্ষকরা ধরেই নিতেন যে বাচ্চা ঠ্যাঙানো উনাদের নৈতিক দায়িত্ব! উনারা যদি সে দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করেন তবে তো সন্তান উচ্ছন্নে যাবে! শিশুদের বলা হতো, "গুরুজনের মার যেখানে লাগে সেই অঙ্গটা বেহেশতে যায়!" ওরা ওদের গোটা শরীরটা বেহেশতে পাঠাতে ইচ্ছুক থাকলেও শিক্ষকরা কেন যেন ওদের নিতম্বকেই বেহেশতে পাঠিয়ে ক্ষান্ত দিতেন! যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে তখনকার সময়ে যে শিক্ষক যত কড়া হতেন, যত পিটুনীতে পারদর্শী হতেন তার থাকত তত কদর।

ঐ হিসেবে দেখতে গেলে বাম্বু স্যারের যে শহরের ভেতর প্রায় তারকাখ্যাতি ছিল সেটা সহজেই আন্দাজ করা যায়। বলা হতো, বাম্বু স্যার যখন বেত হাতে ঠান্ডা চোখে তাকাতেন–তখন ছাত্র তো কোনো ছাড়, অভিভাবকদেরও প্যান্ট নষ্ট করার জোগাড় হয়ে যেত। সেই বেত তারকা বাম্বু স্যারের ছাত্ররা এখন বিভিন্ন বড়ো বড়ো জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত রূপে বসে আছেন, কেবল স্যার হারিয়ে গেছেন কালের অতলে।

ডা. মো. রমজান আলীকে প্রথম পুরুষ ধরলে ফাইয়াজরা স্যারের বংশের তৃতীয় পুরুষ। ফাইয়াজদের সময় আসতে আসতে পিতামহের কিছুই অবশিষ্ট ছিল

না, থাকার মতো বলতে পুরোনো সময়ের মানুষজন একটু আধটু চিনত-জানত, আর ওদের পিতামহের খাতিরে একটু সমীহ দেখাতো, ব্যাস এতটুকুই। বৈষয়িক সম্পত্তি বলতে রয়ে গিয়েছিল এই বাড়িটা, তিন পুরুষের ভিটেটুকু।

বিগত ষাট বছরের ভেতরে এই প্রথম বাড়িটা খালি পড়ে আছে। এই প্রথম বাড়িটা জনমানব শূন্য হলো। গেটের ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা সাতটা বাড়ি এতিমের মতো দাঁড়িয়ে আছে, দরজাগুলো হাট করে খোলা, ভেতরটা মালপত্রশূন্য। কয়েকদিন আগের নিলামে এখানকার সকল মালপত্র বিক্রি হয়ে গেছে, সস্তায় *'হরির লুটের বাতাসা'* এর মতো কাড়াকাড়ি করে জিনিসপত্রের দখল বুঝে নিয়েছে লোকজন।

সরু পায়ে চলার পথটুকুতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ফাইয়াজ, ওর সারামুখে একটা সাদা ব্যান্ডেজ বাঁধা, শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। ছোটো ছোটো চোখ দুটো মেলে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে বাড়িটা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মায়াময় চেহারার মেয়েটার নাম রেহানা। এই রেহানা না থাকলে হয়তো এতদিনে ফাইয়াজও থাকত না। ফাইয়াজের বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রাখা লাল ডায়ারিটা, ওর পিতামহের শেষ চিহ্ন।

ফাইয়াজকে ঘিরে মশারা ভূরিভোজে মেতে উঠেছে, যদিও ওর সেসব দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। আগামীকালকে এখানে বুলডেজার ঢুকবে, *'জে সি বি'*-এর *দোর্দণ্ড* প্রতাপে গুঁড়িয়ে যাবে ওর শেষ আশ্রয়স্থলটুকু, আনুষ্ঠানিকভাবে *শেকড়হীন* হয়ে পড়বে ও। দু'চোখ বেয়ে দরদর করে নামছে চোখের জল, গালের ব্যান্ডেজটুকু চোখের জলে ভিজে সপসপ করছে।

রেহানা ওর কাঁধে হাত রেখে নরম সুরে বলল, "ফাইয়াজ, ডু ইট, নাও।"

ফাইয়াজ অবিশ্বাসের চোখে একবার রেহানার দিকে তাকালো আরেকবার হাতের ডায়ারিটার দিকে, তারপর ডায়ারিটা মাটিতে ফেলে পকেট থেকে দেশলাইয়ের প্যাকেট বের করল। সে আজকে এখানে এসেছে সকল পিছুটান ছিন্ন করতে! মাত্র দুটি কাঠি লাগল ডায়ারির শুকনো ঝরঝরে পাতাগুলোতে আগুন লাগানোর জন্য। ডায়ারিটা পুড়ছে, ওর পিতামহ পুড়ছেন, ওর স্বপ্নেরা-সুখেরা পুড়ছে, ওর বুকের পাঁজর-অস্থি-মজ্জা সবই পুড়ছে। আগুনের আলোয় ওর ছোটো ছোটো শান্ত চোখ দুটোর ভেতরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিছু একটা করার নিষ্ঠুর তাগিদ! পকেট থেকে লাল রঙের স্প্রে বোতলটা বের করে আনল। কদিন আগের যেই ঘরটা ওর *'বাড়ি'* ছিল সেটার দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। রং স্প্রে করে করে লিখল কিছু একটা।

রেহানা অবাক চোখে লেখাটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট ডাজ ইট মিন?"

ফাইয়াজ রেহানার হাত দুটো আঁকড়ে ধরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইট মিনস, আই'ল বি ব্যাক টু রি-পে মাই ডেবট্!"

রেহানা ভীষণভাবে মাথা নাড়তে লাগল আর হড়বড় করে বলতে লাগল, "ইউ ও'ন্ট, ইউ ক্যান্ট, আই'ল নেভার লেট ইউ ব্যাক ইন দিস হেল!" তারপর হঠাৎ করেই শক্তভাবে জড়িয়ে ধরিয়ে ধরে ফাইয়াজকে। ফাইয়াজ কিংবা রেহানা কেউই তখনও জানত না, রেহানা যতদিন বেঁচে থাকবে সে তার কথা রাখবে, সে ফাইয়াজকে ফিরতে দেবে না এখানে, কিন্তু বছর তোরো-চৌদ্দ পর যখন নিষ্ঠুর *'কর্কট রোগ'*-এর ছোবল রেহানাকে কেড়ে নেবে ওর বুক থেকে, তখনও কি সে এখানে না ফিরে পারবে? সে প্রশ্নের জবাব তো সময়ই দিয়ে দেবে।

ও আর রেহানা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেল বাড়িটা থেকে, ফাইয়াজের তিন পুরুষের ভিটেটা থেকে। সেদিন সকালে যখন প্রথম আলোর রেখাটা সূর্যের বুক থেকে বেরিয়ে আসবে ধরণিকে চুম্বন করতে, যখন কাক ডাকা ভোরে সূর্যের আলোটুকু সরাসরি এসে পড়বে এই বাড়ির দেওয়ালটাতে, তখন দেখা যাবে লাল রংয়ে লেখা একটা পঙক্তি জ্বলজ্বল করছে দেওয়ালের বুকে।

"বাতি জ্বেলে রেখো প্রিয়,
অন্ধকার বুকে জড়িয়ে বারবার ফিরে আসব;
আমাদের এড়ানো যায় না!"

গৌরচন্দ্রিকা পর্ব

অধ্যায় ১

"আপনার নাম-ই তো ইরাজ, নাকি?" প্রশ্নটা ভেসে এলো পেছন থেকে।

ইরাজ বেশ বিরক্তির সাথে পেছনে ঘুরল, সে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার একটা ছোটোখাটো কমেডি ক্লাবের সামনে, বাসায় ফেরার জন্য রিকশা খুঁজছে। আজকে ক্লাবের কর্তাদের সাথে তার খুব একচোট হয়ে গেছে টাকাপয়সা নিয়ে! ওর ভাবতেই অবাক লাগে—এটা দুহাজার আঠারো সাল। পৃথিবী এখন কতটা এগিয়ে গেছে, মানুষের রুচি এখন কতটা উন্নত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের মানুষজন নাকি এখনও স্ট্যান্ডআপ কমেডি কী জিনিস সেটাই বুঝে না! ওরা আসে—"একটা হাতি ছিল আর একটা পিঁপড়া..." টাইপ কৌতুক শুনতে, যেটা ইরাজের ঠিক আসে না। সে পোকার ফেস কমেডিতে পারদর্শী, দর্শকরা ও জিনিস বুঝে না, তার শো'তে মানুষ আসে না, কর্তাদের ভাড়া উঠছে না, ওর পেট চলছে না...ব্লা ব্লা ব্লা!

মাথার ভেতরে এসব চিন্তার জগাখিচুড়ি চলায় মেজাজটাও ছিল বিগড়ে, হুট করে এরকম একটা প্রশ্ন শুনে মাথাটা আরও গরম হয়ে গেল ওর।

"হুম!" মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক জবাব দিলো সে।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, "আমার নাম আশিক, আশিক রহমান।"

ইরাজ ভালো করে আপাদমস্তক জরিপ করতে লাগল লোকটাকে, বেশ লম্বা, গাট্টাগোট্টা চেহারা, মুখে এবড়োখেবড়োভাবে ছড়িয়ে আছে কিছু দাড়ি, চোখ দুটো ছোটো ছোটো আর কেমন যেন কুতকুতে, দেখে মনে হয় কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছে সবসময়ই! ওর কাছে লোকটা কী চায়?

ইরাজও হাত বাড়িয়ে আলতো করে একটা ঝাঁকি দিলো, "পরিচিত হয়ে খুশি হলাম আশিক সাহেব।" তারপর উনাকে উপেক্ষা করে রাস্তার দিকে তাকালো, ভাবল এতে হয়তো ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করে চলে যাবেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ভেতরে চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

"রিকশা খুঁজছেন? আপনি চাইলে কিন্তু আমি আপনাকে ড্রপ করে দিতে পারি।" ভদ্রলোক আবার বললেন ওকে।

"আচ্ছা গায়ে পড়া লোক তো!" ইরাজ মনে মনে ভাবল, তার মেজাজও এখন গরম হতে শুরু করেছে। "আপনার কাছে কি আমি লিফট চেয়েছি?" থমথমে গলায় বলল ইরাজ।

ভদ্রলোকের মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুঁটে উঠল, তারপর কৌতুকমাখা গলায় *গডফাদার* মুভির বিখ্যাত ডায়লগটা বলতে লাগল, "আই'ল মেক ইউ অ্যান অফার, ইউ ক্যান্ট রিফিউজ!"

এবারে ইরাজের সামান্য মজা লাগতে শুরু করল, সে হাসতে হাসতে ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞাসু স্বরে বলল, "আচ্ছাহ?"

আশিক সাহেব এবারে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বুক-ক্যাফের ম্যানেজারি করবেন ইরাজ সাহেব? আপনি যেসব জবের পেছনে সিভি নিয়ে দৌড়াচ্ছেন তার চেয়েও অনেক *হ্যান্ডসাম স্যালারি* পাবেন, থাকা খাওয়া ফ্রি, সাথে সপ্তাহে একদিন সেই ক্যাফেতেই স্ট্যান্ড-আপ পারফর্ম করার সুযোগ।"

ইরাজ যে বিভিন্ন জায়গায় উপযাচক হয়ে সিভি জমা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তার যে এখন অর্থের প্রয়োজন সেটা লোকটা ভালো করেই জানে, অর্থাৎ খোঁজখবর নিয়েই এসেছে। ইরাজ লোভে চক চক করে ওঠা দৃষ্টি আড়াল করে নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় বুক ক্যাফেটা?"

"সুনামগঞ্জ! সিলেট বিভাগের একটা মফস্বল শহর ওটা।" নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলো ভদ্রলোক, তারপর জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে জানতে চাইল, "চেনেন?"

ইরাজ উত্তেজনায় ফুলে ওঠা ফুসফুসকে স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে মিনমিনে স্বরে জবাব দিলো, "নাম শুনেছি।"

"আপনি বোধহয় আগ্রহী না, আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করলাম..." ভারিক্কি চালে বলতে লাগল লোকটা।

ও তাড়াতাড়ি করে উনাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "না না! আমি আগ্রহী! যথেষ্ট পরিমাণেই আগ্রহী!"

আশিক সাহেবের মুখে আগের সেই দুর্বোধ্য হাসিটা আবার ফেরত এলো, তিনি পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

"আজকে সন্ধ্যায় এই ঠিকানায় চলে আসবেন।"

কথা শেষ করেই হন হন করে হাঁটতে লাগলেন তিনি, পেছন থেকে ইরাজ ডাক দিয়ে বলল, "ক্যাফের নামটাই তো জানালেন না।"

ভদ্রলোক উলটো ঘুরে সরাসরি ওর দিকে তাকালেন, তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, "বনলতা টি কেবিন!"

অধ্যায় ২

"মঙ্গলদ্বীপ জ্বেলে,
অন্ধকারে দু'চোখ আলোয় ভরো প্রভু,
তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো,
তাদের মার্জনা করো প্রভু"

মায়ের মিঠে গলার গানে প্রতিদিনের মতো ঘুম ভাঙল চিত্রার, আড়মোড়া ভেঙে বিছানা ছাড়ল সে। ঠাকুর ঘরে মা গান শেষ করেছেন, শিলা বউদির উলুধ্বনি আর সাথে শঙ্খ কাসরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। স্নান সেরে একটা তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল আয়নাটার দিকে নজর দিলো চিত্রা। নিজের মনেই হাসল আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে। টকটকে ফর্সা কিংবা দুধে আলতা রং বললে ওর ক্ষেত্রে একফোঁটাও বাড়িয়ে বলা হবে না। ধারালো চোয়াল, তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা একজোড়া ঠোঁট, ঠোঁটের ঠিক নিচটাতে একটা তিল, এক কথায় যেন কোনো মহাকাব্যের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা অনিন্দ্য সুন্দরী এক অপ্সরা। সুন্দর মেয়েমাত্রই বোকা বা ন্যাকা হওয়ার যে ভুল ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত তা ওর ব্যাপারে একদমই খাটে না। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, মগজাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে চলতেই ভালোবাসে। তবে চিত্রা একইসাথে পুরোপুরি সচেতনও আছে ওর রূপ সম্পর্কে এবং যতটুকু সম্ভব এর পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারই করে থাকে।

হালকা প্রসাধন সেরে কচি কলাপাতা রংয়ের শাড়িটা পরে, ছোট্ট একটা টিপ কপালে দিয়ে নিচে নামল ও। টেবিলে বসে ওর বাবা সাধন রায় নাস্তা করছেন, পাশে মা মিত্রাদেবী একহাত ঘোমটা টেনে বসে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন। মাথার ওপরে সিলিংয়ের ফ্যানটা ভনভন করে ঘুরছে তাও মায়ের এসব আদিখ্যেতা দেখলে ভীষণ হাসি উঠে ওর। নেহায়েত বাবা সামনে তাই গলা ফাটিয়ে হেসে উঠতে পারছে না। চুপচাপ বাবার উলটোদিকে খেতে বসল।

সাধনবাবু আঁড়চোখে মেয়ের সাজগোজের বহর দেখে আবার প্লেটের দিকে তাকালেন। হালকা গলাখাকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় রওয়ানা এই সাত সকালে?"

চিত্রা ঢোক গিলে নিয়ে আড়ষ্টভাবে জবাব দিলো, "রিনিদের বাড়িতে যাবো একটু, ওর দিদির বিয়ের কেনাকাটা আজ।"

চিত্রার গলাটা হালকা একটু কাঁপল, এমনিতে ও গলা না কাঁপিয়ে চোখে চোখ রেখে হড়বড় করে মিথ্যা বলতে পারে, তবে বাবার সামনে এলে যেন সকল জারিজুরি শেষ হয়ে যায়। একটা কেমন যেন একটা বোবা ভয় ওকে আচ্ছন্ন করে

ফেলে, মিথ্যেগুলো যেন জিভের ভেতর আটকে যেতে চায়। ওর কথা যে পুরোপুরি মিথ্যা তেমনটাও নয়। ও সত্যিই এখন রিনিদের বাসায় যাবে, আর আজ সত্যিই রিনির দিদির বিয়ের কেনাকাটাও আছে। যেটা সত্যি নয় সেটা হলো চিত্রা ওদের সাথে কেনাকাটায় যাবে না, ও রিনিদের বাসা থেকে বেরিয়ে সরাসরি চলে যাবে অরিন্দমের মেসে। আজকে অরিন্দমের মেস পুরো ফাঁকা থাকবে, রিনিকে বলা আছে বাসা থেকে খোঁজ করলে যেন বলে চিত্রা ওর সাথেই ছিল।

সাধনবাবু আর জেরার ভেতরে গেলেন না, চুপচাপ খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে উঠে গেলেন। উনার অনেকগুলো ব্যাবসা, তবে স্বর্ণালঙ্কার আর কনস্ট্রাকশনের কাজটা এর মাঝে প্রধান। কালীবাড়ী পাড়াটাকে অনায়েসেই বেনেপাড়া বলা যায়। সারি সারি গয়না বানানোর কারখানা, ছিলা অ্যান্ড পালিশ হাউজ, জুয়েলার্সের দোকান এসব রয়েছে। সবগুলো দোকানের মধ্যমনির মতো হয়ে আছে সাধনবাবুর *'রাজলক্ষ্মী জুয়েলার্স'*। রাজলক্ষ্মী উনার মায়ের নাম ছিল।

কালীবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একদম বিপরীতে সাধনবাবু অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা দোতলা মার্কেটমতো বানিয়েছেন। ওপরতলাটা ভাড়া দেওয়া, নিচতলাটা পুরোটাই উনার। সিংহভাগ জুড়ে জুয়েলার্স আর বাকি অবশিষ্টাংশে রড সিমেন্টের দোকান। দু'টোর মালিকই উনি। জুয়েলার্সে নিজেই বসেন, রড সিমেন্টের দোকানে বসে উনার বড়োছেলে অসীম রায়। ছোটোছেলে অমল রায় বিলেতে পড়াশোনা করতে গেছে।

সাধনবাবুর ছোটোবেলাটা কেটেছে খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে, ইশকুলের গন্ডি-ই পেরোনো হয়নি উনার। সারাজীবনে উদয়াস্ত খেটে অর্থ-সম্পদ অনেক করে ফেলেছেন, কিন্তু তবুও মানুষজন আড়ালে আবডালে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ঠিকই হাসিঠাট্টা করে বেড়ায়। উনার কানে এসব এসে পৌঁছায় না তেমনটাও নয়, তবে কিছু করার নেই।

ছেলেগুলোকে তাই সর্বোচ্চ পড়াশোনা করানোর দৃঢ়সংকল্প ছিল উনার মনে। কিন্তু বড়োলোকের বখে যাওয়া সন্তান বলতে যা বোঝানো হয় অসীমবাবু ঠিক তাই। টেনেটুনে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত গড়ানো সম্ভব হলো, তারপর তার ওপর থেকে সরস্বতীর করুণা সরে গেল। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে, দোকানের কাজে নিযুক্ত করে তাকে সংসারী করার জন্য যতটুকু করা যায় সবটুকুই করেছেন সাধনবাবু।

অমল তার বড়োভাইয়ের ঠিক বিপরীত। ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো, তাই বাবার স্বপ্নপূরণের ভারটা ওর কাঁধেই গিয়ে বর্তেছে। সাধনবাবু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে।

বাড়ির সামনে গোছানো একটা ছোট্ট বাগান, উনার স্ত্রী মিত্রাদেবীর অনেক

শখের বাগান। গোটা এলাকা বাউন্ডারি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, একপাশে পাড় বাঁধানো ছোট্ট পুকুর, পুকুরপাড়ে অনেকগুলো ফলজ গাছের সমাহার, অন্যপাশটায় বাগান। ঠিক মাঝখানটায় উনার দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে গাড়িবারান্দা থেকে একটা সরু পথ গিয়ে শেষ হয়েছে গেটে। গেট ঠেলে বের হলেই রাস্তা, রাস্তার বিপরীতে কালীবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গেটের ঠিক ডানে, গেটের গা ঘেঁষেই উনার দোতলা মার্কেট ভবন। পুরো জায়গাটা সাধনবাবু কিনেছেন তেরো-চৌদ্দ বছর আগে। আগে নাকি বেশ কয়েকঘর পরিবার থাকত এখানে, এখন ওরা কোথায় আছে কে জানে?

সাধনবাবু গেট ঠেলে বেরিয়ে আসতেই দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল, উনি নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সালাম গ্রহণ করে; এসে দাঁড়ালেন জুয়েলার্সের সামনে। ভেতরে তাকিয়ে দেখেন ম্যানেজার সৌরভ হাত নেড়ে নেড়ে হাসি হাসি মুখে টুলে বসা একজন মহিলাকে গয়না দেখাচ্ছে আর কিছু একটা বোঝাচ্ছে, মহিলাও মুগ্ধচোখে ওর দিকে তাকিয়ে কথা শুনছেন।

সৌরভ ছেলেটা শিক্ষিত, একইসাথে সুদর্শন। মাথার ওপরে বাবা-মা কেউ নেই, পরিবার বলতে এক বড়োভাই আছে যে খুব সম্ভবত মানসিক প্রতিবন্ধী। সৌরভকে এ বিষয়ে সাধনবাবু যতবারই জিজ্ঞেস করেছেন ও ভদ্রভাবে এড়িয়ে গেছে। ছেলেটা খুবই বিশ্বস্ত, অনেকবার টাকা-পয়সার ব্যাপারে ছিনিমিনি করার সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, ছেলেটার মধ্যে ওসব নেই। আর পরিশ্রমীও খুব, দোকানের জন্য সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেই যাচ্ছে।

সাধনবাবুর খুবই পছন্দের এই ম্যানেজার ছেলেটা, উনার এমনও ইচ্ছে আছে যখন চিত্রার পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে তখন ছেলেটাকে পদোন্নতি দিয়ে তারপর চিত্রার সাথে বিয়ে দেবেন। তবে ব্যাপারটা তার একান্তই গোপনীয় মনের ইচ্ছে, এখনো কাউকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেননি এ ব্যাপারে, এমনকি উনার স্ত্রীকে পর্যন্ত না।

অধ্যায় ৩

অরিন্দমের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত তিনটা বেজে গিয়েছিল, তাই এত সকালে ঘুম ভাঙার কথা নয়। কোনো কাজ বা তাড়া আছে এমনটাও নয়, তবুও অজানা কোনো এক কারণে ওর ঘুমটা ভেঙে গেল। একটু বিরক্তি নিয়েই উঠে এসে জানালার পাশে বসল। জানালার বাইরে শরতের শান্ত সুরমা নদী। খুব কোমল আর স্নিগ্ধভাবে বয়ে চলছে, কোনো তাড়া নেই যেন নদীটার,

দেখে কে বুঝবে এই শান্ত মেয়েটাই ক'দিন আগে বর্ষায় প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছিল। ভোরের ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাসটা অরিন্দমের খালি গায়ে যেন আলতো পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। পর্দাটা পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ একটা সিগারেট বের করে ধরালো।

আজকে মেসে কেউ থাকবে না আর বুয়াও আসবে না। একটু পরে চিত্রা আসবে হয়তোবা। একবার ঘরের দিকে চোখ বুলালো সে। পুরো ঘর অগোছালো হয়ে আছে, চেয়ারটাতে গাদা করে রাখা ময়লা কাপড়-চোপড়, রং-তুলি-ইজেল সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘরজুড়ে, এখানে ওখানে ময়লা-ছেঁড়া কাগজ-সিগারেটের অবশিষ্টাংশ-পোড়া ছাই ইত্যাদি জমে আছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, আজকেও চিত্রার ঝাড়ি হজম করতে হবে।

বিছানার ঠিক উলটোদিকে একটা বিশাল বুকশেলফ, তাতে থরে থরে বই সাজানো। সেই শেলফের একদম ওপরের তাকে একটা মাটির আবক্ষ নারী-মূর্তি রাখা, যার চোখ দুটো জ্বলজ্বলে কালো মার্বেল পাথরের তৈরি। মূর্তিটা প্রথম দেখায় অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় না, তবে খুব কাছ থেকে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে চোখদুটির মধ্যে সামান্য পার্থক্যটুকু নজরে আসে। এর দুটো চোখ একরকম নয়। বিছানার দিকে *'ড্যাব ড্যাব'* করে তাকিয়ে থাকা ঐ চোখ দুটোর একটা আসলে হিডেন ক্যামেরা।

'ইএসপি' ক্ষমতা কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলতে আমরা যা বুঝি তা হয়তো মেয়েদের ভেতর খুবই প্রবল। এই পর্যন্ত বিভিন্ন শহরের অন্তত পক্ষে তিন থেকে পাঁচজন মেয়ে ঐ মূর্তির সামনে রতিক্রিয়ারত অবস্থায় অরিন্দমকে বলেছে, "সোনা, তোমার ঐ মূর্তিটা ঘুরিয়ে দাও না, কেমন যেন 'ড্যাব ড্যাব' করে আমাদের দেখছে মনে হয়! ওটার সামনে এসব করতে কেমন একটা অস্বস্তি লাগে।" ও প্রত্যেকবার হেসে উড়িয়ে দেয় ওদের কথা তবে মনে মনে শঙ্কিত হয়।

অরিন্দম ভেবেছিল সুনামগঞ্জ একটা পশ্চাতপদ মফস্বল, এখানকার আর কি-ই বা এমন উন্নতি হয়েছে, জনপদের পাশাপাশি মেয়েগুলোও হয়তোবা প্রাচীনপন্থী। এখানে এলে হয়তো মূর্তিটার সাথে সাথে ওকেও সংযমের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। সুনামগঞ্জের প্রথম কয়েকটা দিন ব্রহ্মচর্য পালন করেওছিল। তারপর ওর সাথে চিত্রার দেখা হয়।

চিত্রার কথা মনে হতেই ওর ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটে ওঠে। বিছানায় মেয়েটা যেন কামোন্মত্ত বাঘিনী! আঁচড়ে কামড়ে অরিন্দমকে একাকার করে ফেলে। হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে আসায় সেটা ছুঁড়ে ফেলল পানিতে, তারপর দরজা খুলে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। ওদের বারান্দাটা একদম রাস্তা লাগোয়া।

রাস্তার বিপরীতের বাড়িটা ধীরাজদের। ধীরাজ পেশায় পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, ধীরাজের স্ত্রী কামিনী বউদি কোমরে কাপড় গুঁজে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে।

তিনফুট উঁচু বাউন্ডারি দেওয়াল সীমানা রক্ষা করতে পারলেও আব্রু রক্ষা করতে পারেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অরিন্দম স্পষ্টভাবেই কামিনী বউদির দেহের প্রত্যেকটা বাঁক-উপবাঁক-উপত্যকা অভিজ্ঞচোখে জরিপ করে নিতে পারছে।

কামিনী বউদি ঝাড়ু দেওয়া শেষ করে হঠাৎ-ই খেয়াল করল অরিন্দম বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর গোটা শরীরটা চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে। বউদি পোড় খাওয়া রমণী, ধীরাজকে বিয়ে করে এখানে থিতু হওয়ার আগে কৈশোর যৌবন সবই কেটেছে পুলিশ বাবার সাথে সাথে বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে। অনেক অনেক ছেলের সাথে মিশেছে, কাছ থেকে দেখেছে, কারো সাথে বন্ধুত্ব তো কারও সাথে তার চেয়েও কিছু বেশি ধরনের সম্পর্ক হয়েছে। তবে অরিন্দমের মতো কারো সাথে উনার মেশার সৌভাগ্য হয়নি, ছেলেটার মধ্যে কিছু একটা আছে, আলাদা কিছু একটা। নির্লজ্জ ধারালো চাহনী, নিষ্পাপ হাসি আর সুগঠিত শরীর, ওর দিকে তাকালেই যেন নিজেকে সামলানো কষ্ট হয়ে পড়ে। কামিনীর পুরো শরীর উত্তেজনায় ঝিম ঝিম করে উঠল, একটা হালকা দুষ্টু মুচকি হাসি অরিন্দমের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উলটো ঘুরে ঘরের দিকে ছুটে গেল সে।

বারান্দা থেকে কামিনী বউদির বাঁকা হাসি, দৌড়ের তালে তালে জেগে ওঠা হিল্লোল—এসব দেখে অরিন্দমেরও পাগল হওয়ার জোগাড়। এ পাড়ায় অরিন্দম এসেছে প্রায় তিনমাস হয়ে গেল। স্নানসেরে আধভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে ভেজা কাপড় শুকাতে দেওয়ার সময় হালকা চোখাচোখি, কিংবা রাস্তাঘাটে একটু আধটু হাসি বিনিময়, দুয়েকটা নির্দোষ ঠাট্টা-ইয়ার্কির মধ্যে সীমাবদ্ধ ওর আর কামিনী বউদির সম্পর্ক। নেহায়েত ধীরাজ পুলিশে চাকুরি করে বলে, নাহলে প্রথমদিকে যখন অরিন্দম ব্রহ্মচর্যের ক্ষুধা পোষে নিয়ে ঘুরছিল, তখন কি সে একটাবারও *'মাছ টোপ গিলে কি না'* সে চেষ্টা করে দেখত না? তবে দিন দিন যেরকম খোলামেলা ইঙ্গিত পাচ্ছে তাতে কতদিন নিজেকে সামলে রাখতে পারবে সেটা নিয়েও সন্দেহ হচ্ছে ওর।

আস্তে আস্তে গোটা পাড়াটা জেগে উঠেছে, আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে বাচ্চাদের গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে করে নামতা জপা, কর্তাদের হাঁক-ডাক, রান্নাঘর থেকে *'ছ্যাসস্-ছ্যাসস্' 'ছরর-ছরর'* টাইপ শব্দ, রিকশার টুংটাং এসব শোনা যাচ্ছে। অরিন্দম মুখ-হাত ধুয়ে দরজা তালা দিয়ে এগুলো মোড়ের মাথায়।

কয়েকটা টং, একটা ভাতের হোটেল, দুটো মুদি দোকান, একটা ফার্মেসি, একটা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আর একটা ইলেক্ট্রনিকস্ ও হার্ডওয়্যারের দোকান নিয়ে ছোটো কিন্তু জমজমাট মোড়। অরিন্দম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকে পরোটা আর মিষ্টি অর্ডার দিলো। অনেকেই সকালে মিষ্টি খেতে পারে না, খালি পেটে মিষ্টি খেলে নাকি গা গুলায়। অরিন্দমের সেসব সমস্যা নেই। পরোটা মিষ্টি খেয়ে টংয়ে বসে

আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে অবলীলাক্রমে এক শলাকা বেনসন অ্যান্ড হেজেসের মাথায় আগুন ধরায়। ওর এখন নিজেকে মধ্যযুগের কোনো সামন্ত রাজা মনে হচ্ছে। 'পেট ভরতি তো দুনিয়া ঠান্ডা' কথাটা নিছকই কোনো কথার কথা নয়!

অধ্যায় ৪

'গুজাউড়া পুল' থেকে একটু সামনে এগিয়ে, যেখান থেকে *'বুড়িস্থল পয়েন্ট'* এক দেড় মিনিটের হাঁটাপথ, ঠিক সেখানটাতেই–ফিশারির লাগোয়া রাস্তার কোল ঘেঁষে একটা আড়াইতলা বিল্ডিং। আড়াইতলা বলার কারণ হলো দোতলায় মাত্র একটা রুম আর বাকিটা খোলা ছাদ। ঐ রুমের মাথার ওপরে আরেকটা রুম, ঐ রুমটি ছাড়া ভবনের তৃতীয় তলা বলতে কিছু নেই, তাই হিসাব শেষে আড়াইতলা ছাড়া একে আসলে অন্য কিছু বলাও যায় না।

দোতলার খোলা ছাদ জুড়ে অনেকগুলো ছাউনির মতো ছাতা মেলে দেওয়া। ছাতার নিচে গোল টেবিল আর টেবিল ঘিরে রাখা কয়েকটা চেয়ার দিয়ে। দোতলার কাউন্টার ঘরটার লাগোয়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরের নিঃসঙ্গ ঘরটাতে যাওয়া যায়, সিঁড়ির গোঁড়ায়ই লেখা আছে, *'প্রাইভেট প্রোপার্টি, স্টে অ্যাওয়ে'*। ওপরের সেই নিঃসঙ্গ রুমটাতেই থাকেন এই আড়াই-তল-বিশিষ্ট ভবনের মালিক। আড়াইতলা ভবনের নিচতলায়, অর্থাৎ সদর-দরজার ঠিক ওপরেই বিশাল বড়ো সাইনবোর্ড। তাতে বড়ো বড়ো হরফে লেখা,

বনলতা টি কেবিন

লেখাটা আবার ছোটো ছোটো নিয়ন বাতি দিয়ে মোড়ানো যা রাতের বেলা ঝিকিমিকি করে জ্বলে নিভে। এছাড়াও রাস্তার লাগোয়া একটা স্টিলের সাইনবোর্ড আছে যেটাতেও তির চিহ্ন দিয়ে ভবনটা নির্দেশ করা, সাইনবোর্ডের মাঝখানে স্পষ্ট অক্ষরে নামটাও লেখা।

এই নামটাও ভবনের মালিকের আরেকটা পাগলামি। প্রতিষ্ঠানটা আসলে একটা সেল্ফ-সার্ভিস বুক-ক্যাফে। এখানে চা-কফি দুটোই পাওয়া যায়, কিন্তু নামের বেলায় কফির অস্তিত্বই নেই, শুধুই টি-কেবিন!

ক্যাফের দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই একটা ছোট্ট বুক কাউন্টার, ক্যাফের ভেতরে সাজিয়ে রাখা কোনো বই পছন্দ হলে এবং সেটা কিনতে চাইলে এখানে আসতে হবে। কাউন্টারে এসে নাম বললে পেছনের রুম কাম গুদাম থেকে বইটা এনে, সেটা প্যাকিং করে, ক্রেতার হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং এখানেই বইয়ের

দামটা পরিশোধ করে তারপর নিয়ে যাওয়া যাবে।

সেই কাউন্টার থেকে একটু সামনে এগোলেই আরেকটা লম্বা কাউন্টার। এই কাউন্টারের পেছনে দুজন কর্মী সদা প্রস্তুত থাকেন যাদের একজন স্ন্যাক্সের দায়িত্বে অন্যজন পানীয়ের কাউন্টার দেখছেন। লাইনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নিজের খাবারটা নিজেই বহন করে নিয়ে যেতে হয় কাউন্টার থেকে। কাউন্টার-লাগোয়া দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

কাউন্টারের বিপরীত পাশে সারি সারি ছোটো ছোটো টেবিল সাজানো। প্রত্যেক টেবিলের সাথে দু'টো করে চেয়ার। পুরো আয়তাকার ঘরটার প্রত্যেকটা দেওয়ালের সাথে বুককেস লাগানো, যাতে সারি সারি বই সাজানো। তাছাড়াও প্রত্যেক সারি টেবিল থেকে অন্য সারি আলাদা করার জন্য কোমরসামন উচ্চতার বইয়ের তাক ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোও বই দিয়ে ঠাসা। ইচ্ছেমতো বই টেনে নাও আর চা কফি খেতে খেতে পড়তে থাকো। ভেতরটা অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কার আর ঝাঁ চকচকে, দেখে বোঝার কোনো উপায়ই নেই গোটা জায়গাটা মাত্র ছয়জন কর্মী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দোতলায় যদিও বইয়ের কোনো বালাই নেই। এখানে চলে খাওয়া দাওয়া সাথে আড্ডা-হুল্লোড়-প্রেম! দোতলার কর্নারে ছোটো মঞ্চমতো আছে, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতেই গান-কবিতা-কৌতুকের আসর বসে। ঐসব আসরগুলোতে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকে অর্থাৎ টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। আসরে বসে কেউ যদি চা-কফি কিছু খেতে চায় ওটার জন্য আলাদাভাবে চার্জ করতে হয়।

সুনামগঞ্জ শহরের জন্য বুককাফে ধারণাটা একেবারেই নতুন। অল্পবয়স্ক এবং অমিশুক এক যুবক রয়েছে এটার পেছনে, নাম – আশিক রহমান। চওড়া আর ভারী দেহের গঠন, ছোটো ছোটো কুতকুতে চোখ আর মুখভরতি অযত্নে বাড়তে দেওয়া লম্বা এবং অগোছালো দাড়িগোঁফসহ আশিককে যদিও ভয়ালদর্শন বলেই মনে হয়, তবুও কারো সাথে এখন পর্যন্ত কোনো খারাপ ব্যবহার করেছে এমনটা শোনা যায়নি। আশেপাশের এলাকার মানুষরা ওর সম্পর্কে বলতে গেলে নামটা ব্যাতিত আর কিছুই জানে না। ক্যাফের সকল কাজ পরিচালনা করে ওর তরুণ ম্যানেজার - ইরাজ।

এত তরুণ বয়সে এরকম একটা জায়গায় এত বিশাল বিনিয়োগ আর ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাবসা করতে অনেক মুরব্বিস্থানীয় লোক নিরুৎসাহিত করেছিল, তবে লোকের কথামতো চলার ধাত নেই আশিকের ভেতরে, এরই ফলাফল এই *'বনলতা টি কেবিন'* নামক চমৎকার বুক-ক্যাফেটি।

বুড়িস্থল জায়গাটা সুনামগঞ্জের শহরতলী ছাড়িয়ে অনেকটাই বাইরে। অজপাড়াগাঁ বললেও পুরোপুরি ভুল বোঝায় না, অনেকটাই কাছাকাছি মানে

বোঝায়। এই গ্রামাঞ্চলে ধানক্ষেতে পাশে খামার করলে মেনে নেওয়া যায়, তবে বুক ক্যফে খুললে সেটা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ হয় সেটা তর্কের দাবি রাখে। বনলতা টি কেবিন যে চলবে না, আশিক রহমানকে যে বিশাল অঙ্কের গচ্ছা গুনতে হবে সেটা সম্পর্কে সবাই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়েই বনলতা সাফল্য পেয়ে গেল।

বেশ কয়েকটা শিল্প-সাহিত্য অনুরাগীর দল তাদের পার্মানেন্ট আস্তানা বানিয়ে ফেলল বনলতায়। দূর দূরান্ত থেকে বাইক হাঁকিয়ে অনেক তরুণ তরুণী আসতে লাগল। শহরের বাইরে বাতাস খেতে গুজাউড়া পুল কিংবা ফিশারিতে যারা বেড়াতে আসত তারাও একবার করে ঢুঁ দিয়ে যেত এখানে। দোতলাটা আড্ডা দেওয়া, মূলত আলোচনার জন্য বানানো হলেও কীভাবে যেন এখানে বসে প্রেম করার সুখ্যাতি রটে যায়, বিকাল হলেই কপোত-কপোতীদের আনাগোনা দেখা যায় এখানে।

বনলতার শুরুর দিকে—বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে একটা কৌতুকের শোয়ে অংশগ্রহণ করে বিখ্যাত হওয়া কমেডিয়ান টাঙুয়ার হাওড় ঘুরতে সুনামগঞ্জে আসে। উক্ত কমেডিয়ানের সাথে ভালোই জানাশোনা ছিল ইরাজের, তারা একই কমেডি ক্লাবে শো করতো একসময়। তার সাথে কথা বলে বনলতায় একটা ঘরোয়া শো করাতে রাজি করিয়ে ফেলে ম্যানেজার ইরাজ। পুরো সুনামগঞ্জ জুড়ে মাইকিং ও প্রচার প্রচারণা চলে। আশিকের নির্দেশ অনুযায়ী একটা বিশাল অংকের টিকিটমূল্য ধরা হলেও সবগুলো টিকিট বিক্রি হয়ে যায়! ঐ কমেডিয়ানের শোয়ের দিন লোকের ঢল নেমেছিল যেন বনলতার চত্বরে। এভাবেই বনলতা টি কেবিন চড়ে বসে আলোচনা আর খ্যাতির শীর্ষে।

এখন তো গোটা সুনামগঞ্জে 'বনলতা টি কেবিন' লোকে এক নামে চেনে, যদিও আশিক রহমান এখনও রয়ে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালেই। অনেকেই ভাবে ইরাজই হয়তোবা বনলতার মালিক। আশিক এখন আড়াইতলার নিঃসঙ্গ কামরাটাতে বসে বসে সিসি টিভিতে সবকিছু দেখা আর ওয়াকি-টকি দিয়ে স্টাফদের নানা ধরনের নির্দেশনা দেওয়া ছাড়া ব্যাবসায় সরাসরি কোনো ধরনের যোগদান দেয় না। ওর কাছে বনলতা কেবল একটা মুখোশ, যেটার আড়ালে লুকিয়ে সে সুনামগঞ্জ কাঁপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা কষে চলেছে দিনরাত!

অধ্যায় ৫

লোডশেডিং চলছে তাই অরিন্দমের ঘরের পুরোনো ঝরঝরে সিলিং ফ্যানটা ঘুরছে